উইলসনের কিছু একটা হয়েছে, কিছু একটা ঠিক নেই ওর মধ্যে। কী যে হয়েছে ওর এখনো ঠিক ধরতে পারছি না। একটা বেড়াল সে পোষে; সেটাও দিব্যি সুস্থ আছে। সারাক্ষণ উদাস আর মন কেমন করা চাহনি নিয়ে বসে থাকে যতক্ষণ ঘরে থাকে।

কি হয়েছে ওর সেটা নিয়ে স্থূল কিছু ধারণা করতে পারছি; কিন্তু এত স্থূল কোনও সমস্যা উইলসনের জন্য ভাবা ঠিক না। সে এতটা মানুষের মতন মানুষ না। আরও Subtle কিছু একটা ভাবতে হবে ওর অসুখের নাম দেয়ার জন্য।

উইলসন আমার বাল্যকালের বন্ধু নয়। মাত্র কয়েকবছর হলো আমার সাথে ওর দেখা, একটা ক্যাফেতে- একদিন ঝিলমিলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বসে আছি তাই একটা কফি অর্ডার দিলাম। কফিটা এলো; আমার থেকে কয়েক চেয়ার দূরে, দেখলাম আরও এক ভদ্রলোক, আমার মত করেই ব্লাক কফি উপভোগ করছেন একা একা।

দেখেই কিউরিয়াস মাইন্ড আর আলাপ পরিচয় না করে থাকতে পারলো না। নিজের কফির টেস্ট হুবহু অন্য কারও মধ্যে দেখতে পেলে তাঁকে তো সোল-মেট মনে হয়; ওয়েল সোল-মেট না হোক; ব্যাটাকে একটু জোর করতেই পরের মাসেই ফ্লাট-মেট হয়ে গেলো।

তিনটা মাত্র রুম বাসায়; দেড়খানা দিলাম উইলসন'কে। বাকী দেড় খানা আমি নিলুম। কীভাবে এই দেড় খানা রুম ভাগাভাগি করে নিলাম সেটা অন্য কোনোদিন বলবো। অনেকটা ঐ দেশভাগের সময় ব্রিটিশদের করা ছিটমহলের মতন।

আমার কামরা থেকে উইলসনের কামরা'টা দরজা খোলা থাকলে একটু দেখা যায়। কিছুটা ঘাড় বাকিয়ে দেখলাম সে বাতি নিভিয়ে ফ্লোরের মধ্যে বসে আছে। সিগারেট'টা নিভিয়ে দিয়ে ওর রুমের দিকে গেলাম। রুমের চারপাশে কতগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে মধ্যখানে সে বসে আছে।

বললাম –
প্রেমে ছ্যাকা ট্যাকা খেয়েছো বলে কি প্লানচ্যাট করে প্রেমিকার জীবিত আত্মা নামাতে চাইছ?

কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। যেভাবে সে বসেছিল, সেভাবেই বসে আছে। মাঝখানে উইলসনের বিড়ালটা এসে দুইটা জ্বলন্ত মোমবাতি তার লেজে লাগিয়ে ফেলে দিলো। এসব পাগলামি দেখার কোনও মানে নেই। আছে অবশ্য, উইলসন মোটেও বোরিং লোক না। সে খুবই ইন্টারেস্টিং লোক, তার অনেক কাজ কর্মই কোনও অর্থবহ করে না আমার কাছে। কিন্তু সে মোটেও বোরিং টাইপ না। ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং পিপল সে।

যাইহোক, রাতে নিজের রুমে এসে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভয় লাগছিলো- হে ঈশ্বর এই পাগলা ফ্লাটমেট আমাকে মোমবাতির আগুনে পুড়িয়ে মারবে না তো!!! যদি মোম থেকে ঘরের পর্দায় আগুন লাগে? যদি সে আগুন রান্নাঘরে চলে যায়? যদি সারা ঘরে আগুন চলে আসে? কী হবে এসব আগুনের লেলিহান শিখায় আমার!!!

আমি দুটো জিনিস বড্ড ভয় পাই, এক হলো সাপ, দুই আগুন। আগুন আমি এত ভয় পাই, বলা যায় যে আগুনকে আমি সমীহ করি। সিগারেট টা খাওয়ার পরে প্রতিবার সেটার শেষ প্রান্তে জল দিয়ে নিশ্চিত করি যে ওটা আর জ্বলছে না; তবেই সেটাকে ফেলি এসট্রে তে।

পরেরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে। অফিস যাওয়ার তাড়াহুড়ো তে বেচারা উইলসনের আর খোঁজ নেয়া হলো না।

রাতে বাসায় এসে সোজা গেলাম উইলসনের রুমে। কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে দরজার পাশে রাখলাম। আমার অস্তিত্ব টের পেয়েই উইলসন নামের এই অদ্ভুত প্রাণীটা বলতে শুরু করলো-

জাহিদ তুমি কি জানো মানুষ কেন নিজেকে পুরোপুরি ভালোবাসতে পারে না? কেন সে নিজের ক্ষেত্রে স্বার্থপর হতে পারে না?

যাক! এই প্রাণীটা কথা অন্তত বলছে দেখে ভালো লাগছে, আর আমার ঘর-দোরও কিছু আগুনে পুড়ে যায় নি। এই আনন্দে নিজেই কিচেনে গেলাম কফি বানাতে। কফি নিয়ে আবার এলাম উইলসনের কাছে। তাকে একটা মগ দিতেই সে ন্যাওটা ছোট্ট কুকুরের মত কৃতজ্ঞতার চোখ করে বললে-

One can not fully love himself until he is fully done with the world.

আমি বললুম, তো তুমি নিজেকে পুরোপুরি ভালোবাসতে পারছ না বলে এত কাহিনী, নাকি তুমি এখনো পৃথিবীর সাথে Fully Done হয়ে উঠতে পারো নি বলে?

জবাবে আমাকে স্বরচিত দুই লাইন কবিতা শোনালো। সে বললো –

নদী শাসনের মতন নিজেকে শাসন করে গতিপথ বদলে যাব দূরে
মেঘালয় থেকে হিমালয়; আমার নাম তুমি দিও গঙ্গোত্রী হিমবাহ

সে ইদানীং মাঝেমধ্যে বেখাপ্পা কবিতাও লিখেটিখে, এই গুণটা সে আমার থেকেই রপ্ত করেছে বলে আর বেশি কিছু বললুম না; স্রেফ বললাম- লাইনগুলো ঠিক নেই, ভাব আছে, শব্দের ঠিক ঠিকানা নেই। পরে ঠিক করে আবার ভেবে আমাকেও পাঠিও।

উইলসন যে শুধু কবিতা বলেই ক্ষান্ত এমনটা না। দুই দিন ধরে সে ঘরের মধ্যেই, অফিস যাচ্ছে না, খাচ্ছে না ঠিকমত। আমি জানি সে আরও কিছু বলবে। তাই আবারও তাকে উস্কে দিলাম –

তো, কবিতা আর প্লানচ্যাট ছাড়া আর কোনও কিছু উদ্ধার করেছো কি?

আমাকে সে আবার বললো – তুমি জানো জাহিদ? কেন মানুষ খুব একটা আয়েশ করে মানুষকে ভালোবাসতে পারে না?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজেই বললো-

Loving another person requires undivided attention, and that requires time and loving their own self, but these days everyone is still struggling with the world….. Hence, no one has time to pay any undivided attention.

আর সহ্য কারতে না পেরে, আবার বলেই বসলুম;

ভেবেছিলাম তুমি অতি সূক্ষ্ম কিছু একটা নিয়ে যন্ত্রণাতে আছো; ভালোবাসা, প্রেম এসবের মতন এত স্থূল একটা বিষয় তোমাকে ভাবাচ্ছে; এত বোরিং তুমি কবে থেকে হলে!!! এবার যেন একটু অভিমান করেই বললো,

এত বড় একটা কথা তুমি আমায় বলতে পারলে? ভালোবাসা, প্রেম; এসব ছাড়াও তো আমি তোমায় অনেক কিছুই বলি। সেদিনই একটা মারাত্মক ফিলোসফিক্যাল কথা বললাম, তুমি যেটা ধরতেই পারলে না!!

আমি একটু নাক টান দিয়ে চোখ ছোট করে বললুল-
কোনটা?
সে বললো- কেন ঐ যে দিন দুপুরে খেতে খেতে বললাম যে –

When the universe tells you a truth, that means you are not the right person for it.

একটা বোকা বোকা হাসি এনে বললুম –
রাইট! আমি ভুলে গেছিলাম যে, You're a mediocre philosopher too.

উইলসন'কে আমি মনে মনে যত ভৎসনা করি না কেন, সারা ঘর এলোমেলো করে রাখে বলে মনে মনে তাকে গালাগাল দিলেও- সে লোকটা ভালো। নিজের মধ্যেই থাকে। নিজের মধ্যে কি একটা পৃথিবী বানিয়ে রাখে। মাঝেমধ্যে সে এমন কিছু কথা বলে- যার সত্যিই কোনও মানে হয় না। অন্তত আমাদের এই ঐহিক পৃথিবীতে তো ওসবের কোনও মানেই নেই। নিজেই কখন যেন মনে মনে বলে উঠলাম যে – My ability of not understanding him, has something to think. Which emplies he might be a philosopher …

এটা ভাবতে ভাবতে মনে মনে নিজের একটা বানান ভুল ধরে ফেললাম, Implies এর শুরুটা e দিয়ে শুরু করেছি। তারমানে আমার ব্রেইন এখন লজিক্যাল, ইল-লজিক্যাল কোনও কিছুই প্রসেস করতে পারছে না।
আই নিড স্লিপ।

উইলসনকে বলা যাবে না, বললেই বলবে – মানুষের এত সাউন্ড স্লিপ কেন দরকার এটা ভেবে দেখেছো? ডলফিন তো দিব্যি অর্ধেক ব্রেইন সুইচ অফ করে একপাশে কাত হয়ে জলের উপরে ভেসে ভেসে ঘুমায়। এসব হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে সম্বিৎ ফিরে পেলাম উইলসনের কথায় –

আমাকে সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিজে জিজ্ঞেস করলো,

কি চাও তুমি? বলো বলো— কী চাও! কী চাওয়া পাওয়া তোমার লাইফে!

একবার ওর দিকে তাকালুম, আরেকবার ওর রুম থেকে আমার রুমে কম্পিউটার টেবিলের দিকে; বললুম-

আমাকে একটা ভালো দামী দেখে মাউস কিনে দিও তো।

উইলসন কিছুটা মন খারাপ করে বললে-

ধ্যাত! তুমি জীবন বোঝ না – তুমি দুঃখ বোঝো না। মানুষ বোঝো না। মানুষের ভাষা বোঝো না।

বললুম, তুমি বোঝো?

সে বললো
বুঝি আলবাত! তবে আর চাই না, আমি আর চাই না বুঝতে। আমি চাই না মানুষ মানুষকে বুঝুক পড়ুক।

বললাম, এক্সিলেন্ট। নিজের ভেতরেরও কিছুটা ফিলোসফি জেগে উঠলো- তাই বলেই ফেললাম।
বেশ। যত খুশি অস্বীকার করো। বেশি করে করো – “Denial is the ultimate comfort zone.”

উইলসনের রুম থেকে নিজের রুমে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি; ঘুমাতে হবে- ঠিক তখনই হতচ্ছাড়া আমার দুর্বলতায় আঘাত দিয়ে বসলো। জিজ্ঞেস করলে-

আচ্ছা! তুমি তো কবিতা টবিতা লেখো, কেন লেখো? আর কীভাবে লেখো?

টু বি অনেস্ট রাত ২ টা প্রায় সারাদিন অফিস করে এসে উইলসনের এর ভাঁড়ামি আর একদম সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে, প্রাণ চাচ্ছে- ওয়েল কি চাচ্ছে জানি না। তাই আবার মুখ খুললাম উইলসনের প্রশ্নের উত্তর দিতে।

বললুম – হ্যাঁ লিখি – কিন্তু কবিতার মতন এত সূক্ষ্ম জীবন নয়। জীবনের আবেদন, জীবনের বিলাপ এত স্মুথ, আর সূক্ষ্ম নয়। জীবনের চাওয়া পাওয়া, দুঃখ খুবই স্থূল হয়ে আসে কখনো।
আমরাই সেগুলোকে শৈল্পিক রূপে পাঠকের কাছে পলিস করে সাজাই, মেলে ধরি- কবিতার নামে।

শেষে বললুম- উইলসন একটা লিটল এডভাইস জাস্ট শুনবে?
আগ্রহ নিয়ে বললে- বলোঃ

বললুম – উইলসন, তুমি ঠিক এখন এই মুহূর্তে কে, বা কী আমি জানি না। আমি মানুষ আমার পক্ষে এত জানা সম্ভব না। তবে তোমায় বলি- তুমি নিজেই এক উইলসন, এখন আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে আরেক উইলসন এসে ভর করেছে। ignore him, he is just an idea.